Vol. 35 | No. 2 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বিমূর্ত শিল্প : সাহিত্য

Volume	35
Issue	2
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী দীন মুহম্মদ
Published online	February 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i2.1
Pages	১-৩০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বিমূর্ত শিল্প : সাহিত্য

কাজী দীন মুহম্মদ

॥ ১ ॥

কোন দার্শনিক মনীষী বলেছেন: স্রষ্টা যা সৃষ্টি করতে লজ্জা বোধ করেননি তার প্রকাশে মানুষের এত লজ্জার কারণ কি! কথাটা অনেকবার ভেবে দেখেছি, কূল-কিনারা পাইনি। কয়েকদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি হাইকোর্ট এবং কার্জন হলের মাঝখানের মহাসড়কটির পা-পথে একট মেয়ে শুয়ে থাকে। হয়ত অভাবী। ক্ষুধার তাড়নায় ভিক্ষার একটি পদ্ধতি হিসেবে এটি বেছে নিয়েছে। কিন্তু হাইকোর্টের সিংহদ্বার থেকে বেশ দূরে। তাই মনে হয়, হাইকোর্ট মাজার-কেন্দ্রিক পাগলদের অন্যতমা নয়। কথাটা এত বেশি রসিয়ে বলার কারণ ছিল না। কারণ এ দৃশ্য আমাদের দেশে নতুন নয়, বিচিত্রও নয়। অত্যন্ত সাধারণ। কিন্তু দৃশ্যটির অবতারণা অন্য একটি কারণে। মেয়েটির বয়স পঁচিশের উপর হবে না। অন্তত তার দেহে তাই বলে। ক্ষুধায় হাড় জিরজিরও নয়, মোটামুটি নাদুস-নুদুস। রং ফর্সা নয়, আবলুশ কাঠের মতও নয়। সাদার সঙ্গে ছাই মিশ্রিত। সর্বাঙ্গে তার বিন্যস্ত ভস্ম কিংবা ধুলা-মাখা, বোধ করি কেশেও। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যাবে হয় পাগল, নয় দুস্থ। সুতরাং একবার দেখেই দিবার হ'লে দিয়ে দিবেন, নয় চলে যাবেন, দ্বিতীয়বার তাকাতে পারবেন না। তাকাতে পারবেন না, তার দুস্থ চেহারার জন্যে নয়, তার নোংরা পরিবেশের জন্যে নয়, তাকাতে পারবেন না তার যৌবন প্রকাশের

আদিখ্যেতার জন্যে, স্টাইলের জন্যে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত সাথে থাকে একটি দেড়টি শিশু, সময় সময় দুগ্ধপোষ্য, সময় সময় ভাড়া করে আনা, সময় সময় নিজস্ব। কিন্তু এ নিছক একা। আর আসে ঠিক অফিস শুরুর অর্থাৎ ন'টার আগে যায় কখন জানিনা। পরিধানে তার দেহের তুলনায় নোংরা তেনা। শুয়ে থাকবে রাস্তার দিকে মুখ করে ফুটপাথে লম্বালম্বি। যৌবন যুগল উন্মুক্ত। তাকাতে পারবেন না বলেছিলাম এজন্যে। তবে, এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে শুয়ে থাকে যে, আপনি হেঁটে গেলে না তাকিয়ে উপায় নেই, বিশেষ করে যদি বিপরীত ফুটপাথে থাকেন। তবে সবচাইতে কম তাকায় আমাদের তরুণরা, ছাত্ররা। এ দৃশ্যটিও এমন কিছু 'প্রাণহরা' নয় যে, এতোটা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে হবে। কেন বলছি, অল্পক্ষণেই তা পরিষ্কার হবে। এর আগে আরো একটি দৃশ্যের অবতারণা করি। শরৎকাল। সারমেয়-সারমেয়ীর প্রেম নিবেদনের বছরে এই একটি মাত্র মোক্ষম সময়। কামায়নের কোন্ রীতিতে পড়ে জানিনা, কোন এক নিষ্ঠুর 'নিষাদ' ধারাল অস্ত্রের এক কোপে কামনিরত কুকুরটির কামদণ্ড কেটে ফেলে দিল। কুকুরটির সে কি কান্না!

একদা নিষাদ কামনিরত ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চির একটিকে বধ করে অপরটির মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। এ দৃশ্য দেখামাত্র মহামুনি *বাল্মিকীর* মুখ থেকে নিষাদের প্রতি বেরিয়ে এসেছিল অভিশাপ বাণী:

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম গম শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনা দেকমবধী কাম মোহিতম ।।

—কাম মোহিত ক্রৌঞ্চ মিথুনকে বধ করেছিস, হে নিষ্ঠুর নিষাদ, তোর প্রতিষ্ঠা নেই।

আর সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বের করুণতম গাথা, অন্যতম মহাকাব্য রামায়ণ।

জানিনা যে অবিমৃষ্য কাম-মোহিত সারমেয়যুগলের প্রতি এ কর্মটি করেছিল তাকে কেউ অভিশাপ দিয়েছিল কি না, কিংবা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন করুণ মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল কিনা!

এ দুটো চিত্র উদ্ধৃত করেছি একটা কারণে। বাস্তবের নগ্ন প্রকাশ সম্বন্ধে অর্থাৎ বাস্তব তথা পরাবাস্তব চিত্রাঙ্কনে ও কাব্যরচনায় আমরা যে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছি, সে সম্বন্ধেই দু'একটা কথা বলব বলে।

যুগে যুগে শিল্প-সাহিত্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী মুখ্য হ'য়ে উঠেছে। শিল্পী যখন যৌবন, জগৎ ও প্রকৃতিকে ঠিক যেমনটি দেখেন তেমনটি রূপায়িত করেন, তখন তাকে বলি বস্তুতান্ত্রিক বা রিয়ালিস্টিক। বাস্তবধর্মী শিল্পী স্থানীয় পটভূমি বা যুগমানসের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে সমসাময়িক ঘটনা বা কাহিনীর অবতারণায়, নর-নারীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায়, বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক সভ্যতার পরিপোষক শব্দসম্ভার গ্রহণে, এমন কি, দেহের সূক্ষ্ম বর্ণনায় ও প্রাকৃতজন-সুলভ ভাষা অনুকরণে তাঁর শিল্পকর্মের বহিরঙ্গ নির্মাণ করেন।

এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম প্রধান কারণ বোধকরি উনিশ শতকের পজিটিভিজ্‌ম। দার্শনিক *কোঁতে (comte)* এবং তার শিষ্যবর্গ এ ধারার প্রবর্তক, ধারক এবং পোষক। এ যুগের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশিক্ষণে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিকতাও অনেকখানি কাজ করেছে। এমন কি, এ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপোষক দলের অন্যতম স্থানীয় জার্মান দার্শনিক *ফেরবাক (Feuerback)* বিজ্ঞানভিত্তিক একদেশদর্শী

যৌক্তিকতার আলোকে মানুষের আধ্যাত্মিক জগৎ ও আত্মিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নশ্বর এ প্রত্যক্ষ জৈব জীবনকেই চরম ও পরম বলে ঘোষণা করেন। এ ধরনের জীবন-দর্শনও সাহিত্য ও শিল্পে বস্তুতন্ত্র আমদানীর সহায়ক হয়েছে। ফরাসী সাহিত্যে *ব্যালজাক (Balzac)*, *ফ্লবা্য (Flaubert)*, রাশিয়ান সাহিত্যে *তুর্গেনিভ (Turgenev)*, *টলষ্টয় (Tolstoy)*, ইংরেজী সাহিত্যে *থ্যাকারে (Thackeray)*, *ডিকেন্স (Dickens)*, *এলিয়ট (Eliot)*, *বেনেট (Bennett)* প্রমুখ সুস্থ বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যের ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে ফরাসী সাহিত্যের ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কতিপয় ইংরেজ সাহিত্যিক তাদের সাহিত্যে জীবনের গোপন ও কুশ্রী দিকটির যথাযথ অভিব্যক্তি দানের চেষ্টা করেন। এর ফলে সাহিত্যে আলোকচিত্র সুলভ বাস্তবতার তো আমদানী হলোই, অধিকন্তু শিল্পকর্মে নির্লজ্জ, অশোভন, এমনকি, কুৎসিৎ দিকটির উদ্‌ঘাটন ঘটল, কবির মানসদীপ্ত অনুভূতির নির্বাসন ঘটল।

জীবনের গোপনীয় কুৎসিৎ দিকটির স্থান সাহিত্যে হতে পারে না, এমন কথা কেউ বলবে না। কিন্তু শিল্পী যদি দেহ থেকে দেহাতীতের সৃষ্টি করতে না পারেন, তাহলে তার সৃষ্টির সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিকতা, 'যৎদৃষ্টং তৎলিখিতং' সাহিত্যের সীমানার অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে কি না এ নিয়ে অতি আধুনিকতার সমর্থকদের যুক্তির অন্ত নেই। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, এ ধরনের কল্পনা স্থূলতার তথ্যাশ্রয়ী। এবং অর্থনীতিতে, রাজনীতিশাস্ত্রে, সরকারী বিবরণীতে, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নাম-ডাকের বইতে অথবা বাজার-হিসেবের খাতায় তথ্যঘটিত

সত্যের অভাব রয়েছে বলে আমরা কেউ অস্বীকার করি না। কিন্তু এগুলোকে সাহিত্য বলে মেনে নেয় এমন কেউ আছে বলে জানা নেই। নিছক বস্তুতান্ত্রিক অন্য কোন প্রয়োগ থাকলেও তা শিল্প নামক রূপকর্ম পদবাচ্য হ'তে পারে কিনা সন্দেহ। যদি কেউ মানুষের কল্যাণার্থে সত্যসন্ধানী হ'য়ে শারীরবিদ্যার তথ্যগত সত্য আবিষ্কার করেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেন তবে তা একটি শ্রেষ্ঠ 'দেহবিদ্যার' গ্রন্থ হ'তে পারে, কিন্তু তা সাহিত্যের সীমানায় পড়ে কি? মানুষ জীব, কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, আশরাফুল মখলুকাত, এ কথাটি, এ সত্যটি যদি মননশীলতায় উজ্জীবিত না হ'য়ে ওঠে তবে সে শিল্পে মানুষের কী কাজ বুঝা গেল না। শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মে রক্ত-মাংসের মানুষই রূপায়িত হয়, সেখানে মানুষের দুর্বলতাকে স্বীকার করে নিয়েও, তাকে মাটির পৃথিবীতে রেখেও, অমৃতের স্পর্শে গরীয়ান করে তোলা হয়, সে হয় 'স্বতন্ত্র বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রম'। তাই বলা যায়, নিছক বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য বিশুদ্ধ শিল্প-রূপ-কল্প-বিরোধী, কাজেই সাহিত্যের অনুপজীব্য। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়:

> The weakness of realistic art is that it does not create beauty, power, significance or meaning greater than the representation of mediocrity and triviality.

আর এর ফলে নিছক বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য অনেক সময়ই সার্থক রূপ সৃষ্টির (work of art) পর্যায়ে উন্নীত হতে সমর্থ হয় না।

সাহিত্যের যা বাস্তব তা নিছক জড় বাস্তব নয়; চিন্ময় বাস্তব।

বাস্তবকে রূপান্তরিত করে নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়ে সুন্দর সুষমামণ্ডিত রসমূর্তিতে প্রকাশই প্রকৃত সাহিত্য তথা ললিত শিল্পের কাজ।

তবে প্রশ্ন উঠবে যে, তাহলে কাব্য বা ললিত শিল্পের একমাত্র উপজীব্য কি নিছক ভাববাদ? না, নিশ্চয়ই নিছক ভাববাদ নয়। বাস্তবতা ভাববাদের স্পর্শে কাব্যগত সত্যে উন্নীত হয়েও ভাষাতিরেকের সীমা ছাড়িয়ে যাবে না। অপরপক্ষে ভাববাদও লেখকের আত্মপরায়ণ উৎকেন্দ্রিকতামুক্ত হ'য়ে পাঠককে কাব্যসত্যে মুগ্ধ করবে। বাস্তবতা যতই বস্তুনিষ্ঠ হোক, কাব্যে তা ভাববাদের বাস্তবতায় মণ্ডিত হয়ে শিল্পরূপ লাভ করে। এ সম্বন্ধে সমালোচক *স্টিভেনসন* একটি সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন :

> And the true realism were that of the poets, to climb up after him like a squirrel and catch some glimps of heaven for which he lives. And the true realism, always and everywhere, is that of poets: to findout where joy resides, and give it a voice for beyond singing.

॥ ২ ॥

এখানেই কথা আসে এ্যাবস্ট্রাকট্ আর্ট বা বিমূর্ত শিল্প সম্বন্ধে। রিয়ালিজম বা বাস্তবপরতা শিল্প ক্ষেত্রে এমন এক পর্যায়ে 'উন্নীত' হয়েছে যে, এখন আমরা যত দুর্বোধ্য, রং-নির্ভর চিত্র কিংবা শব্দ-

নির্ভর সাহিত্য তথা ইঙ্গিত প্রতীক ইত্যাদি করে এগিয়ে এসেছি দেহের নগ্ন প্রকাশে। কেবল নগ্ন প্রকাশই বা বলি কি করে? বলা যায় অবোধগম্য টেকনো প্রভাবিত জেনারেটিভিজম (incomprehensible abstruse generativism) আমাদের উপর ভর করেছে, আমাদের পেয়ে বসেছে। 'ভর করেছে' বা 'পেয়ে বসেছে' কথাটা বলতাম না। বললাম এ কারণে যে, আমরা বুঝি আর না-ই বুঝি, বাঃ বাঃ করে একজনে হাতে তালি দিলে সবাই মিলে লাগাই হাতে তালি। কোথায় কি হল তার কোন খবরের দরকার নেই। এমনি হুজুগের সুযোগ খুঁজি আমরা। আমাদের চরিত্র সম্পর্কে একটা কথা বলে নেই।

কথাটা বলেছেন *প্রমথনাথ বিশী*, তার *সানিভিলা* নাটকের ভূমিকায়। ঘটনা হলো: একটি লোক ফাঁসি দিয়ে মারা গেছে। পুলিশ এসেছে। দেখতে দেখতে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। পুলিশের হুকুমে যেই ফাঁসির দড়িটি কেটে দেয়া হলো অমনি মৃত লাশটির মুখ থেকে 'আঁ' করে একটি শব্দ বেরিয়ে এলো। আর 'আঁ' শব্দটি শোনামাত্রই চারিদিকে জমায়েত সব লোকেরা হৈ হৈ করে উঠল: জীবিত, জীবিত। বস্তুত ফাঁসির সময় দড়ির বন্ধনে যে বাতাসটুকু গলদেশে ফ্যারিংস্-এর নীচে আটকা পড়েছিল, সে-টিই বেরিয়ে যাবার সময় ঐ আওয়াজটুকু শোনা গেছে। আর সবাই এটিকেই জীবনের লক্ষণ মনে করে উল্লাসে ফেটে পড়েছে। এই তো আমরা!

অতএব, যা বুঝি না, তা না বুঝলে যে, সমাজের চোখে হেয় হয়ে যাই। তাই না বুঝেও বোঝার ভান করতে হয়। বিশেষ করে একদল অসামান্য প্রতিভার অসাধারণ লোক আছেন, যারা এ ধারণাটিকে কেবল টিকিয়ে রাখার নয়, এটিকে রীতিমত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে

জাহির করে একে বুদ্ধিজীবী সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ চিৎকার করছেন। রাজনীতি তথা তাঁদের আর্ষনীতিমালার অন্যতম মোক্ষম নীতির প্রচার ও প্রসারকল্পে একদল মানুষ পরোক্ষ নীতির প্রশ্রয়ে সামাজিক ও অসামাজিক নীতি ও দুর্নীতি নির্বিশেষে সবকিছু গলাধঃকরণ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে তাদের আর্থকৌশল আরোপ করে আমাদের তরুণ সমাজের মগজে ঢুকিয়ে তাদের মস্তিষ্ক বিশোধনের মোক্ষম প্রক্রিয়া সফল করে তোলার অমোঘ অস্ত্রটি প্রয়োগ করছেন। বিমূর্ত শিল্প বা এ্যাবস্ট্রাকট্ আর্ট এঁদেরই মৌল 'কর্মকাণ্ডে'র অন্যতম।

বিষয়টা আরো একটু পরিষ্কার করি। মনস্তাত্ত্বিক রাজনীতি বা সাইকোপলিটিকস্ বিশারদ মাত্রই বিমূর্ত শিল্প বা এ্যাবস্ট্রাকট্ আর্টের কল্পরহস্য এবং উৎসের সন্ধান রাখেন। রুশ বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে বলশেভিকবাদের দর্শন কয়েকটি দিক দিয়ে ব্যাপকতর হয়ে প্রসার লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল। মেকানিক, কাব্য ও সংগীত, যান্ত্রিক থিয়েটার, যান্ত্রিক প্রতিমূর্তি নির্মাণ এবং অবশেষে যান্ত্রিক মানুষ বা রবট তৈরী--এসব বিভিন্ন ধর্মী মাধ্যমে স্পষ্ট আর্টের একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহে বিপর্যয় সৃষ্টি করে শিল্পক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলা ও তৎসহ অসামাজিক 'কর্মকাণ্ডে'র প্রসার ও নবতর 'বাদ'-এর প্রতিষ্ঠা।

এ ধারার শিল্প প্রসারের হোতা রাশিয়া। রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পরপরই এ আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ সময়ই একদল বুদ্ধিজীবী শিল্পী এক ধরনের এ্যাবস্ট্রাকট্ আর্ট বা বির্মূত শিল্পের উদ্ভাবন করেন। যার নাম দেওয়া হয়েছে কন্স্ট্রাকটিভ সিমবলিক রিপ্রেজেন্টেশনাল আর্ট বা সাংগঠনিক বিবৃতিমূলক প্রতীকী

শিল্প। এ দলের অন্যতম গুরুস্থানীয় শিল্পী *এ. শ্যাগস্তাফ*। তিনিই যান্ত্রিক মানুষ সৃষ্টি করে সনাতন নীতির ধ্বংসকামী তরুণ সমাজে এক বিপ্লবী আলোড়নের সৃষ্টি করেন।

এ ধারার শিল্পকলা সম্বন্ধে যাঁরা স্পষ্ট ধারণা রাখেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, আজকের এই Abstract আর্ট বা বিমূর্ত শিল্প প্রধানত রুশ বিপ্লবের প্রথম দিকের তথাকথিত প্রগতিশীল শিল্প আন্দোলনেরই পরিণত ফলশ্রুতি। এ আর্টের মূলে যে তত্ত্ব নিহিত রয়েছে তা হলো, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ধারায় বিদ্যমান ঐতিহ্য, সংহতি ও অখণ্ডতা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তাতে সংহতিবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবধারার উপকরণাদি সুকৌশলে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া। সাংগঠনিক বিবৃতিমূলক প্রতীকী রীতির অনুসারী শিল্পের লক্ষ্যই হচ্ছে ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সনাতন সত্য ও মূল্যমান-নির্ভর ভাবধারায় তথা সমাজ-সংস্কৃতিতে চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি করা। জীবন ও জগৎ দর্শনের মূল্যায়ন এখন থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে করতে হবে। অন্যকথায়, যা কিছু সনাতন, সুন্দর ও ঐতিহ্যমুখী তারই মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিকোণ্ আরোপ করে 'নিহিলিস্ট' মতবাদে ঠেলে দিতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা এতই মন্দ ও অচল যে, তার ধ্বংস হওয়াই উচিত এবং তা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। আর সে উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, সে ধ্বংস ত্বরান্বিত করার জন্য যে কোন মূল্যে বিপ্লবের হুতাসন প্রজ্বলিত করে তাতে উচ্ছৃংখলতার ঘৃতাহুতি দিতে হবে। এই হলো রুশ বিপ্লবের প্রাথমিক নিহিলিস্টদের (nihilist) আন্তরিক বিশ্বাস ও গৃহীত মতবাদ।

এ শিল্পধারার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যক্তিত্বের ভাঙন ও বিপর্যস্তকরণ। আকৃতির বিকৃতি (distortion), বিশ্লিষ্টতা, চিন্তার বিশৃঙ্খলা এবং নির্বীর্যতা--এসবই হলো বিমূর্ত শিল্পের মৌল অবলম্বন। পরাজিত মনোভাব, ব্যর্থকাম মানসিকতা, মনোবিকলন, নৈরাশ্য ইত্যাদির পরিণামে আধুনিক জীবনধারায় ঔদাসীন্য, প্যাসিমিজম--এসব থেকেই এ শিল্পচেতনার উদ্ভব। এসব ভাবের ধারক ও বাহকদের চিন্তা-চেতনা মানসিক ভারসাম্যহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় এতখানি আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, জীবন যুদ্ধে পরাজিত অনীহা ও কর্মহীনতার অদৃশ্য ভাইরাস আক্রান্ত চরম ব্যর্থতায় রুগ্ন এদের মস্তিষ্ক। এ ধারার শিল্পী-সাহিত্যিকদের কোথাও যে যৌবনের জয়গান, জীবনের অকুতোভয় আশাবাদ কিংবা কর্মে নিয়োজিত বলিষ্ঠ জীবনবোধে উজ্জীবিত জীবনের কথা নেই, তা নয়, কিন্তু জীবন সংগ্রামে 'যুদ্ধ করো প্রাণপণে, ভয়ে ভীত হয়ো না মানব'- ধারণাটি নগ্নভাবে অনুপস্থিত। তারা তাদের উপাদান ব্যবহারেও সচেতন ভারসাম্যহীনতার পরিচয় দেন। তাদের রচনায় ফ্র্যাগম্যান্টেল ফ্রেজিওলজি (Fragmental phraseology) বা বিপর্যয় বিশ্লিষ্টতাময় শব্দ ও প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর এসবের মাধ্যমে পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি 'স্তিমিত', 'ধর্ষিত' ও 'নির্বীর্য' হয়ে পড়তে খুব বেশী সময় লাগে না। ক্ষণিকের কণ্ডূয়ন তার মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করে অনাসৃষ্টি বিপর্যয় ও বিশ্লিষ্টতার সৃজনে উত্তেজিত করে তোলে। আজকের পৃথিবীর তরুণ সমাজ এর খপ্পরে পড়ে ক্ষণিকের উত্তেজনায় 'গোষ্পদের জলে' আত্মাহুতি দিয়ে আত্মনির্যাতনের, বিধিবদ্ধ বিধানের বিরোধিতায় হিংসাবৃত্তি চরিতার্থতার শুড়শুড়ি অনুভব করে পরমুহূর্তেই আত্মগ্লানিতে ভেঙে

পড়ে। যার ফলে আত্মহত্যার মতো চরম সিদ্ধান্তও করে বসতে বিলম্ব হয় না।

এ ধারার বির্মূত শিল্প বিস্তারের কারণ জানতে হলে আরো একটু পিছনে যেতে হয়। আমেরিকায় এ শিল্প ধারার নবতর আন্দোলনটি সুপরিচিত ও সুসংগঠিত করার কৃতিত্ব *ওয়াসিলি কান্ডিনিস্কীর*। এ্যাবস্ট্রাক্ট্ আর্টের অন্যতম প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা *কান্ডিনিস্কী* নিউইয়র্কে 'দি মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট' বা আধুনিক শিল্পের যাদুঘর নামে একট অতি আধুনিক প্রদর্শন পদ্ধতির সংরক্ষণাগার স্থাপন করে এ আন্দোলনের প্রক্রিয়াটি পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। মূলত তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থার সদস্য। এ্যাবস্ট্রাক্ট্ আর্ট জনপ্রিয় করে তোলার জন্যই তাঁকে আমেরিকা পাঠানো হয়েছিল। আর *কান্ডিনিস্কী* তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সার্থকভাবেই পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিউইয়র্ক শহরের আধুনিক শিল্পের যাদুঘর 'মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টে'র প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিই তার প্রমাণ। এটি যে মডার্ন আর্টের সৌভাগ্য তা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। অন্যান্য ফ্যাশানের মতই এটি একটি ফ্যাশান হয়ে দাঁড়ালো। হিপ্পি, ন্যুডিস্ট ইত্যাদির মতো ফ্যাশনগুলোর সঙ্গে 'আধুনিক শিল্প'ও ফ্যাশন বাজারে হরিলুটের মতোই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত সাবেক ধারণার প্রতি বিরক্ত উদ্দেশ্যবিহীন জীবন পরিচর্যায় উন্মুখ তরুণ বিশ্বকে মোহিত করে ফেলল। যখন কোন অর্থই নাই তখন অর্থপূর্ণ গাঁজা, আফিম, ভাং, চড়শ, মারিজুয়ানা, হাশিশ, হিরোইন--এসবের মাহাত্ম্যে ভাবের তুরীয় মার্গের স্বর্গীয় অবস্থাটি অবলোকন করে, 'ত্রিলোক ভ্রমণ' করে 'ত্রিভূন নির্বান মুখী' ললিত কলার অনাস্বাদিত-পূর্বরস-সাগরের রসাতলে ডুব দিয়ে দেখতে আপত্তি কি?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলার এসব এ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ শিল্পীকে জার্মানী থেকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছিলেন। এই বহিষ্কৃত শিল্পীরা আমেরিকাতে বসবাস গ্রহণ করেন। আর 'মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট' তাদের আদিরসের উদ্বিগ্নতার ধূম্র নিঃসরণের সুযোগ করে দেয়। ফলে আমেরিকা এ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ আর্টের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। এ আর্টের মাধ্যমে আমেরিকার অর্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় সৃষ্টির বীজ বপণ করার সুযোগ আসে। আর এ সুযোগের অভিযানে সাফল্য লাভ করেই স্বয়ং রাশিয়ার পক্ষে 'বাস্তববাদী শিল্প বা রিয়ালিস্টিক আর্ট' ধারায় প্রত্যাবর্তন ত্বরান্বিত করার অমোঘ সুযোগ এসে যায়। এ প্রক্রিয়ায় বিপর্যস্ত ব্যক্তিত্বে এমন সব জনসংস্থা গড়ে তোলার প্রবৃত্তি বা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা নিছক অযৌক্তিক এবং অধিকাংশ সময় অপ্রাসঙ্গিকও। এমনটাও ঘটে থাকে যে, কিছু সংখ্যক লোক মানসিক দিক থেকে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, আবার কিছু সংখ্যক লোকের পক্ষে সামাজিক দিক থেকে পরিপক্বতা লাভ করার সুযোগ আসে না। তাই দেখা যায়, যে সব লোকের কারণে তারা হীনমন্যতায় বা inferiority complex-এ ভোগে, তাদের প্রতি শ্লেষ বা বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করায় এবং যে কোন সামান্য সুযোগে তাঁদের খোঁচা দেওয়া কিংবা অপদস্থ করার প্রবণতা তাদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠে। আর একই কারণে লক্ষ্য করা যাবে, বাইরের লোকদের সাফল্যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু নিজেদের সমাজের, সমগোত্রীয় বা সমশ্রেণীর কিংবা সহকর্মী লোকদের স্মরণীয় অবদানের মূল্যও স্বীকার করে নিতে দ্বিধায় সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। আর এটি 'ক্রীড়া মনোভাব' (sportsman spirit) জাত ঈর্ষা নয় বরং হীনমন্যতাজাত হিংসা থেকে উদ্ভূত। এ ধরনের কার্যকলাপ দেখে স্বভাবতঃই দুঃখানুভূতি জেগে উঠে এবং তাদের

জন্যেও করুণা হয়। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, এটি বিপর্যস্ত ব্যক্তিত্বেরই ব্যষ্টিগত ও গোষ্ঠীগত মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বর্তমান বিশ্বের সমাজের ব্যক্তিত্ব বিধ্বংসী এবং মনস্তত্ত্ব বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সংস্থাসমূহ কৌশলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে এ প্রক্রিয়া কার্যকরী করার প্রচেষ্টায় রত। যে কোন জাতি বা জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক , শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পরাজিত করার যেমন অনেকগুলো পন্থা থাকতে পারে, তেমনি মানুষের মন-মস্তিষ্ক তথা হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তিকে বিপর্যস্ত করে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করারও নানাবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। আর এ কর্মটি সমাধার অর্থাৎ মানুষের মনকে পরাভূত করার অতি আধুনিক পন্থা হচ্ছে সাবজেকট্ বা শিকারের সামনে অর্থাৎ যাকে পরাভূত করার ইচ্ছা তার সম্মুখে এমন সব নিদর্শন উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে হবে এবং তাদের চারদিকে এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যার ফলে তারা নিগড়ে বদ্ধ থেকেই, বন্দী দশায়ই প্রদত্ত নিয়ম শৃঙ্খলা পালন করায় উৎসাহিত বোধ করবে এবং সার্থকতার সঙ্গে বিধান মান্য করায় গৌরবান্বিত ও কৃতার্থ অনুভব করবে। বিগত শতাব্দীতে বিজয়ী জাতিগুলো বিজিত জাতিগুলোর উপর নির্বিচারে, যে অকথ্য নির্যাতন, অমানুষিক বর্বরতা ও নিষ্ঠুর পাশবিকতার প্রয়োগ-প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত করেছে, উপরে বর্ণিত অতি আধুনিক বিপর্যস্ত মানসিকতা সৃষ্টির পরিকল্পনা অনুযায়ী অবশ্য সে সব পন্থার আশ্রয় নেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। বরং এখনকার দিনের বিজয়ীদের আসল কাজ হলো, বিজিতদের সম্মুখে অস্পষ্ট কতকগুলো উদ্দেশ্যহীন, নিরর্থক ও দুর্বোধ্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুশীলনীয় নিদর্শন উপস্থাপন করা। আর এর মাধ্যমে বিজিতদের চিন্তা-চেতনাকে বিমোহিত মুগ্ধ করে তুলতে পারলেই যথেষ্ট। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন

একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীকে নৈরাশ্য বা হতাশায় আচ্ছন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যহীন 'কর্মকাণ্ডে' এবং অর্থহীন নির্বীর্যতায় মুগ্ধ করে রাখার অব্যর্থ ও কার্যকর শাণিত হাতিয়ার এটি। অস্পষ্টতা ও লক্ষ্যহীনতা, দুর্বোধ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকৃতি প্রভৃতি আসলে এ প্রবৃত্তিকে সার্থক সচল ও ক্রিয়াশীল করে তুলতে নিশ্চিতভাবে সহায়ক হয়। এর নিশ্চিত ফল পেতে দেরী হয় না। সুস্থ জীবনবোধের উজ্জীবনী-রহিত বিকলাঙ্গ মস্তিষ্কের ধারকের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত জীবনে নেমে আসে অবশ্যম্ভাবী অবক্ষয়। যৌন বিকার থেকে আরম্ভ করে জীবনের এমন ক্ষেত্র নেই যে, তারা পরাজয়ের গ্লানির অবমোচনের অপচেষ্টাকে পার্শ্বে ঠেলে ফেলে দিয়ে ক্ষণিক কণ্ডূয়নে পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ না করে। আর এ অধঃপতনের মৌল উৎসই হলো অতি আধুনিক বিপর্যয়-প্রক্রিয়া। এ-ই বস্তুত প্রকৃত বিপ্লব। আত্মঘাতী এ বিপ্লব মানুষকে অবচেতনভাবেই যে মৃত্যুর অতল গহবরে ঠেলে নিচ্ছে, তা চাক্ষুস দেখেও তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা বা স্পৃহা তার নেই, বরং পিচ্ছিল নিম্নমুখী ঢালু পথে নিজেকে আরো দশজনের সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে এক ধরনের পুলকের শিহরণ অনুভব করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। তাই বলছিলাম, একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার, মানসিক অধঃপতনের নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজনীতি-মনস্তাত্ত্বিক পারদর্শীরা যে সব সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক অমোঘ উপাদান প্রয়োগের বিধান দিয়ে থাকেন, তার মধ্যে চোখ ঝলসানো দুর্বোধ্য বিমূর্ত শিল্প বা abstract art অন্যতম প্রধান।

এ ধারায় এ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ আর্টের সুস্পষ্ট বিশেষত্ব এই যে, তাঁদের রচনায় অনেক সময় ব্যক্তিত্বের বিশ্লিষ্টতাই প্রকট হয়ে উঠে। আর এটি হয় বঞ্চনার অনুভূতির তীব্রতার ফলশ্রুতি স্বরূপ। অনুভূতির প্রশ্রয়েই

কার্যত অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা, উদ্দেশ্যহীনতা তীব্রতর হয়ে উঠার সুযোগ পায়। লক্ষণীয় যে, এ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ আর্ট মানবীয় আচরণের এমন সব পন্থা ও বঞ্চনানুভূতি বিকাশের পরিচর্যা করে এবং ব্যক্তিত্বের বিশ্লিষ্টতার এমন সব নিদর্শন উপস্থাপিত করে, যার পরিণামে শেষ পর্যন্ত হৃদয়াবেগ ও উচ্ছ্বাস অসুস্থ ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ হৃদয়াবেগ ও উচ্ছ্বাসের ভারসাম্য ও সুস্থতাই হলো মানবীয় প্রবৃত্তিজাত প্রকৃতি; এক কথায় মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়ক চারিত্রবৈশিষ্ট্য। এটুকু হারিয়ে ফেললেই মানুষ মনুষ্যত্ব থেকে নীচে নেমে যায়, সে পশুত্বের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এ কাজটিই সুনিপুণ শিল্পকৌশলে সাধিত করেন রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানী প্রদত্ত অন্যতম অমোঘ অস্ত্র এ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ আর্ট প্রয়োগের মাধ্যমে।

ধ্বনি বিজ্ঞানের যেমন দুটো প্রধান দিক রয়েছে: articulatory বা উচ্চারণের দিক এবং acoustic বা শ্রুতির দিক, তেমনি সাহিত্য তথা শিল্পের প্রতিটি শাখারই রয়েছে প্রধানত দুটো দিক। এক, আর্টিস্ট কী বলতে চান, তাঁর বাণী বা message কী; দুই, কার উদ্দেশ্যে তার বাণী। এ সঙ্গে আরো দুটো কথা যোগ করা যায়, বাণীর অবলম্বন, মাধ্যম বা মিডিয়া কী এবং তাঁর সে বিশেষ বাণীর উদ্দেশ্য কী! এ চতুর্মাত্রিক বিভাজন স্পষ্টতঃই শিল্পে দীপ্ত হয়ে উঠবে, তবে কোন বিশেষ বিধা বা aspect-এর প্রাধান্য থাকতে পারে।

এ দিক থেকে বিচার করে দেখা যায়, এ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ আর্টের মূল বিধা বা উদ্দেশ্য দুটো: 'কে' ও 'কী'। উদ্দেশ্য 'কে', একথা উপরের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়েছে, মনে করি। একটা জাতি বা জনগোষ্ঠীকে যখন লোটাস ইটার্সদের মতো tired eyelids

upon tired eyes বা নিমীলিত চক্ষু মোহময় তন্দ্রাচ্ছন্ন করার ইচ্ছায়, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে নির্বীর্য করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তখন ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে, আত্মমর্যাদা ও আত্মবোধ থেকে সরিয়ে এনে আত্মবিস্মৃতির সমেহনে নিয়োজিত করার কামনায় অব্যর্থ অস্ত্র হিসেবে সুপরিকল্পিতভাবে এটি প্রয়োগ করা হয়। যারা এর শিকারে পরিণত (victimised) হয় তাদের উদ্দেশ্যেই এটি মনোরম করে পরিবেশিত হয়।

আর মূল লক্ষ্য কী? অর্থাৎ শিল্পী তার শিল্পের মাধ্যমে তার দর্শক, পাঠক ও বোদ্ধার কাছে কী বাণী পৌঁছাতে চান? এখানেই কথা আসে, শিল্পী তাঁর শিল্পের মাধ্যম হিসেবে কী কী গ্রহণ করেছেন? এ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ আর্ট বা অতি আধুনিক বিমূর্ত শিল্পের বাহন কয়েকটি: প্রভাব বিস্তারী শিল্প বা 'ইম্প্রেশনিস্টিক আর্ট', প্রকাশ পন্থী শিল্প বা 'এক্স্প্রেসনিস্টিক আর্ট', ইঙ্গিত প্রধান জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির শিল্প বা 'কিউবিজ্ম' পদ্ধতির আর্ট এবং মহাজাগতিক অবচেতন প্রকাশক্ষম শিল্প বা 'স্যুররিয়ালিস্টিক আর্ট'। এ কয়েকটি পদ্ধতিতেই অতি আধুনিক শিল্পী তার 'এ্যাবস্ট্র্যাক্ট্নেস' বা বিমূর্ততার 'মূর্ত' প্রকাশে প্রয়াস পান।

ইম্প্রেশনিস্ট বা প্রভাব বিস্তার ধর্মী শিল্পী তাঁর শিল্প কর্মে নানা বর্ণের উপর আলোর বিচ্ছুরণে চোখ ধাঁধানো চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে দর্শক ও পাঠককে উচ্চকিত করে তোলেন এবং স্বাভাবিক মনোধর্ম রহিত অকল্পনীয় কল্পলোকের ধারণায় নিয়ে গিয়ে বিবেক ও বুদ্ধিকে আহত করে, মানসিকতাকে থেতলে দিয়ে চাপা বেদনার অস্বস্তির সৃষ্টি করেন। তখন বোদ্ধা রস-চেতনার চাইতে রস-বোধ বিচ্ছুরণের উৎকট অভিধায় সম্মোহিত হন। স্বাভাবিক রসনিবেদনে যে

মোক্ষণ বা Purgation সাধিত হতে পারতো, সে স্থলে অস্বাভাবিকতার পরিমণ্ডলে 'বাজার দেখে তাল গাছের আগায়'।

একস্‌প্রেশনিস্ট বা প্রকাশ ধর্মী শিল্পীর কাজ হলো প্রতীক, বর্ণ, চয়ন ও শব্দ ভাণ্ডার উজাড় করে বস্তু সত্যের অতিরিক্ত (beyond the real out of real) অর্থাৎ বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যকে যতদূর সম্ভব ব্যক্ত করা। শব্দ চয়ন, বর্ণ আরোপ এবং প্রতীকী করণের পর্যায়ে এক মাত্রিক দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক ইত্যাদি নানামাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে বাস্তব সত্যের অতিব্যঞ্জনা সৃষ্টি এ ধরনের শিল্পের লক্ষ্য। এদিক থেকে একজন রিয়ালিস্ট বরং বেশী ঋজু, একস্‌প্রেসনিস্ট বক্র। তিনি 'গাছের মধ্যে মাছ-ফল' লক্ষ্য করতে পারেন; চষা মাঠের রৌদ্রদগ্ধ সাদা মাটির ঢেলায় 'ঝড় তুফানের শিশ্নের দাগ' আবিষ্কার করতে পারেন।

আর কিউবিস্ট বা জ্যামিতিক নকসা ভিত্তিক চিত্র শিল্পী সাধারণত ইঙ্গিত সমৃদ্ধ রূপরেখার মাধ্যমে বস্তু সত্যের ঊর্ধ্বের সত্যকে দৃশ্যময় করে তুলতে চেষ্টা করেন। জ্যামিতির মৌল রূপরেখাই বস্তুর অভ্যন্তরীণ সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করণে মাধ্যমের কাজ করবে। মেকানিকাল আর্ট বা প্রকৌশল শিল্পের প্রকাশে কিউবিজম মোক্ষম মাধ্যম। এমনকি একজন কিউবিস্ট চিন্তা করেন যে, মানুষ আদতে একটি মেশিন, আর মেশিনের ওজনের আকৃতি ইত্যাদি ছাড়াও মূলত কতকগুলো জ্যামিতিক অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত দ্বিকোণ-ত্রিকোণ-চতুষ্কোণ সম্বলিত দ্বিভুজ-ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ বেষ্টিত নক্সার সমষ্টি ব্যতীত কিছুই নয়। কাজেই এ বিশ্ব 'ইম্প্রেশন'বাদী 'একস্‌প্রেশন'বাদীর কাছেই কেবল ভোগ্য ও পরিবেশনযোগ্য 'বস্তু' নয় বরং এর প্রকাশ ও উপভোগে কিউবিজম-এর অধিকার ও চর্চা-

অনুশীলনের দাবীই সর্বাগ্রগণ্য। জ্যামিতিক কায়দায় অঙ্কন পদ্ধতির শিল্প পরবর্তী 'মেটেরিয়াল সায়েন্স' বা বস্তু বিজ্ঞানের আধেয় রূপে স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছে। বিস্তৃতকে সংক্ষিপ্তকরণ এবং সংক্ষিপ্তকে বিস্তৃতকরণ কিউবিজমের অন্যতম কর্ম।

স্যুররিয়ালিষ্ট বা পরাবাস্তববাদী শিল্পীর প্রচেষ্টা হলো মহাজাগতিক অবচেতনকে শিল্পে সাহিত্যে রূপদান করা। মানুষের তথা এ বিশ্বের যা কিছু রয়েছে সবারই চেতনার অগম্য একটি অবচেতন মানসিকতা তথা অবদমিত কামনা-বাসনা-ইচ্ছা--এ সবের সমন্বিত ও এতদসংশ্লিষ্ট আক্ষরিক দিক রয়েছে। তার বিশ্বস্ত রূপায়ণই ঘটে স্যুররিয়ালিস্টের কাছে। মানুষ যা ভাবে ও করে এবং যা ভাবে ও করে না বা করতে পারে না, তারও তো একটা রূপ আছে। আর সে রূপের অন্তর্নিহিত সত্যটি, সেটি যত কুৎসিৎই হোক না কেন, সত্য তো। তা সর্বক্ষণ প্রদর্শনের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। এ ধারণা থেকে কিউবিজ্‌ম্‌, একস্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌ ও ইম্প্রেশনিজ্‌ম্‌-এর ঘাঁটি পেরিয়ে সেই সত্য স্যুররিয়ালিষ্টদের দরজায় এসে দাঁড়ায়। তারই প্রকাশের আগ্রহ অতি আধুনিক বুদ্ধিজীবী তথা অতি আধুনিক রিয়ালিষ্ট মানে স্যুররিয়ালিষ্টই অধীর উত্তেজনায় সৃষ্টির প্রয়াস পান। মানসিক ও জৈবিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তা পরিপোষক কি না, কল্যাণকর কিনা সে বিচার গৌণ, প্রকাশই মুখ্য। কারণ ভগবান যা সৃষ্টি করতে লজ্জা বোধ করেন না, তাঁর সৃষ্ট মানুষ তার প্রকাশে লজ্জিত হবে কেন?

এসব পরম গুণের লক্ষণ দেখেই কোন সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন যে, এ্যাবস্ট্র্যাকট্‌ শিল্প প্রকৃত প্রস্তাবে অত্যন্ত পবিত্র পরম ভাগবনিকও। আর এতে স্রষ্টার গুণাবলীর পূর্ণতর বিকাশ লাভ

সম্ভবপর। কেননা, যা বস্তু সত্য তা তো খোলস মাত্র। দেহের আকৃতি ও মুখাবয়বের স্পষ্টতা ছাড়াই তা সম্পন্ন হয়েছে। আর জাগতিক

দৃশ্যমান বস্তুপুঞ্জকে পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি দান না করেই, তার অন্তর্নিহিত ও অবদমিত অর্ধস্ফুট কিংবা স্ফুটনোন্মুখ কলিসমূহের মাধ্যমে বিশ্বপ্রাণের অন্তস্তলে পৌঁছানোর চেষ্টাই আধুনিক স্যুর-রিয়ালিজম্ তথা 'এ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ আর্টের একমাত্র কাম্য। আর তার পরিণত স্বরূপেই বিশ্লিষ্ট ও বিধৃত প্রকৃত জীবনমুখী তথা মানবতামুখী শিল্পকলা বা আধুনিক আর্ট। ধর্মীয় কায়দায় অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে আমরা একে ধর্মীয় তো বলবই বরং একমাত্র ধর্মীয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। সীমার সঙ্গে অসীমের যে সুস্পষ্ট সাধারণ ধ্যানধারণার বিষয়বস্তু ছিল, তা যেন আরো একটু ঊর্ধ্বে উঠে অসাধারণ অসীমত্বের ব্যঞ্জনায় মঞ্জুরিত হয়ে মহা জাগতিক থেকে 'মহানান্দনিক' রূপ লাভে সমর্থ হয়েছে। এখানেই এ মডার্নইজমের সার্থকতা, মডার্ন আর্টের রস নিবেদনের ক্ষমতা।

।। ৩ ।।

সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, কবিরা আকাশচারী, কল্পনাবিলাসী। তাঁরা জীবনের কন্টক বনে কাঁটা বাদ দিয়ে কেবল পুষ্প চয়নই মুখ্য মনে করেন। তাঁরা যা কোথাও নেই সে অসম্ভব সুখের কল্পনা করে মানুষকে একটা মিথ্যার মোহে মুগ্ধ করে বাস্তব জ্ঞানকর সব সমস্যা থেকে দূরে রাখতে চান। যাদের মানস প্রকৃতি দুর্বল, যারা বাস্তব জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ, যারা

নিতান্তই নির্বোধ বা বাতুল কেবল তারাই কাব্য রসিক। এ ধারণা বারবার প্রচারের মাধ্যমে এতটা মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, সাহিত্য বলতে বাস্তব বিরোধী একটা অসম্ভব অতিলৌকিক কিছুকেই বুঝি। তারমধ্যে বাস্তবমুখীনতা প্রত্যক্ষভাবে বিকশিত নয় বলে. তাকে কেবল অবাস্তব বলে দূরে ফেলে দিই না, বরং তাকে অসম্ভব মনে করে গুরুত্ব সহকারে বুঝবারও চেষ্টা করি না। মনে করি the lover, the lunatic and the poet একাত্ম বলেই আমাদের মত বাস্তববোধসম্পন্ন sane মানুষকেও তাঁদের দলে ভিড়াতে চান। যাঁরা lunatic নন অর্থাৎ যারা বাস্তববোধসম্পন্ন সুবুদ্ধিমান, তাঁরা বাস্তব জীবনের অতি নগ্ন ব্যাপারগুলোকেই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উন্মাদ। এ প্রবন্ধের গোড়ায় যে চিত্র দুটোর উল্লেখ করেছি, এ ধরনের বিবস্ত্র মানসিকতার অপ্রকাশ্য কুৎসিতের নগ্নতা সাধারণ্যে প্রকাশ করার মধ্যেই আর্টের সত্যতার লক্ষণ অবলোকন করেন। তাদের দাবী হলো এই যে, জীবনের সঙ্গে কাব্যের প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হলেই কাব্য জীবনমুখী হবে, তা না হলে যে-কোন সৃষ্টি অর্থহীন অপপ্রলাপে পরিণত হবে। বস্তুত সর্ব বিষয়ে সমান অধিকার দাবীর মতোই সাহিত্যে শিল্পেও 'গণতন্ত্রের' প্রতিষ্ঠা এ ধারণার প্রচারকদের একান্ত কাম্য। অন্নাভাবের সার্বজনীন বেদনা, রসবেদনাও তার সঙ্গে একাত্ম। দেহ-মনের ক্ষুধাই রস পিপাসার নামান্তর। সুতরাং সাহিত্যে সে ক্ষুধার প্রকাশ অনিবার্য। একজন সমালোচক এটিকেই বলেছেন: রস ব্রহ্ম নয়, অন্ন ব্রহ্মই সাহিত্যের দেবতা বলে পূজা পাচ্ছেন। আমার জীবন সত্য, আমার দেহও সত্য, দেহে যে ক্যান্সারের ক্ষতটি তাও খুবই সত্য। কিন্তু তাই বলে দেহের গোপন অঙ্গের দগদগে ক্ষত স্থানটি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করে ভনভনে মাছির সুরে

সুধী অসুধী ও রসিক অরসিক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, এ অধিকার আর্টের রাজ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, সমাজহিতৈষী ভেবে দেখবেন। হ্যাঁ, আমার ক্ষত আমার গ্যাংগ্রিন ডাক্তারের কাছে প্রকাশ করতে হবে; তা নইলে চিকিৎসা হবে কিরূপে। বিশ্বময় সবাইতো আর চিকিৎসক নয় যে, তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। বরং এ ধরনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমাজে রোগ বীজাণু ছড়িয়ে পড়ে এবং তা অতি সাধারণ নগ্নবাদীরও ঘৃণার উদ্রেক করে। এ ধরনের শিল্পে বিধৃত রূপ সুস্থআর্টের লক্ষণ বলে গৃহীত হলে, লোকের 'ড্রইংরুম ও টয়লেট'--বৈঠকখানা ও পায়খানা বলে কিছু প্রভেদ থাকে না। অবশ্য এ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ আর্ট যাদের মনোরঞ্জন করে তাদের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্বের কোন কারণ নেই। কারণ এ হলো রুচির ব্যাপার। আর এ-ও সত্য যে বিভিন্ন রুচিই পরাঃ। রুচির উপর কারো জবরদস্তি চলে না। আরো একটি উদাহরণ দিই: এই যেমন, অন্ন গ্রহণ বা খাবার ব্যাপারটিই ধরা যাক। খাবার ঘরে একটা শান্ত সমাহিত পরিবেশ সবারই কাম্য। আর এ জন্য আমরা দৃষ্টি সুখকর অস্পষ্ট আলো বা dim light এবং শ্রুতি সুখকর মৃদু মধুর সংগীত বা such mild melody-র ব্যবস্থা করি। কিন্তু এ-তো সাধারণের অপরিজ্ঞাত নয় যে, কোন কোন খাবার আড্ডায় ভাঙা গলায় রেডিও বা ক্যাসেটের 'মাই তেরি বন যাউঙ্গা' মার্কা অসহনীয় চিৎকার, বয়-বেয়ারার হাঁক ডাক ঘন্টা পিটুনী সব কিছু মিলে এক অতি বিকট পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তখন খাওয়াটা নেহায়েত দায় সারা গোছের বলেই মনে হয়। হট্টগোলটাই মুখ্য। প্রকৃতপক্ষে আমরা জীবিকার সমস্যা সম্বন্ধে এত যে কোলাহল করি, তা যদি মিটেই যায়, তবেতো জীবনের কোন লক্ষণই থাকে না, প্রাণ স্পন্দনই থেমে যায়। কাজেই জীবনের নীরব চিন্তার বা নিরিবিলি ভাবনার দুঃখময়তা

থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কোলাহল নামক উপাদানটির আমদানী করি এবং যথাসাধ্য কোলাহলে যৎপরোনাস্তি উচ্চৈস্বরে হৈ-হল্লা করে জানান দেই যে, আমিও আছি, আমার দিকে একটু লক্ষ্য করুন সবাই। এটিও রুচির ব্যাপার। মানসিক স্বাস্থ্য কিংবা সৌন্দর্য চর্চায় এর গুরুত্ব কী ও কতখানি বর্তমানের অতি আধুনিক শিল্পকর্ম ও কাব্য সাহিত্যই তার সাক্ষী।

বস্তুত কবি সাহিত্যিক কুৎসিতের মধ্যে সুন্দরকে, ক্ষুদ্রের মধ্যে মহৎকে, ভীষণের মধ্যে মধুরকে, কঠোরের মধ্যে কোমলকে, নিত্যের মধ্যে অনিত্যকে দেখেন বলেই মনে হয় তাঁর জগৎ আমাদের বাস্তব বিশ্ব নয়। আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক অতি-লৌকিক জগৎ কিন্তু কবির কল্পনা মিথ্যা বা অতিচারী নয়। সে কল্পনা এ জীবন ও জগৎকে ক্ষুদ্র অহং সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত করে বৃহৎ ও সমগ্রের সামঞ্জস্য বিধান করে, বাস্তবের সামগ্রিক রূপকেই প্রকাশ করে। এখানেই শিল্পকর্মটি নব সৃষ্টি। 'সে জগতে কাল স্রোত নাই, পরিবর্তন নাহি।'

এখন আধুনিকতার প্রবল প্রতাপে সব কিছুর সঙ্গে সাহিত্যের সংজ্ঞাও বদলে গেছে; সুতরাং সাহিত্যে যে জীবন বিধৃত তারও নতুন সংজ্ঞা বেরিয়েছে। আজ জীবন বলতে মানুষের আত্মনিরপেক্ষ কোনও বিরাট রহস্যময় সত্তা বুঝায় না, তা মানুষের স্বার্থ সম্পর্কিত দেহ-সর্বস্ব একটা কঠিন বাস্তবের সমস্যা। সে সমস্যার নানারূপ। তার জটিলতা উপলব্ধি করার একটা মানসিক উত্তেজনা এবং তারই ফলে ক্লান্তি অবসাদ বিমূঢ়তা বিহবলতা ও হতোদ্যম এখন রসের স্থান দখল করেছে। রসাবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির অবকাশ নাই, তা মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অতএব কবি কল্পনা এখন আর রসসৃষ্টি করবার

জন্য সৃষ্টি হবে না, কবির কাজ সার্থকভাবে এ দ্বন্দ্বকে ঘোরালো করে তোলা। কবি কল্পনার মূলে থাকবে যে উত্তেজনা, যা মানুষের মানস যন্ত্রটিকে সৃষ্টির বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণতর করে তোলে, শাণিত ও হননমুখী করে তোলে। আবেগ প্রসূত চিন্তা বা চিন্তা প্রসূত আবেগই এখন সাহিত্যের উপজীব্য। মানুষের বাস্তব জীবন চেতনাকে প্রখর বিদ্রোহী বিপ্লবমুখী করে তোলাই সাহিত্য তথা শিল্পের প্রকৃত সাধনা। মানুষের নানা জৈবিক সমস্যা মনকে আকৃষ্ট করে বলেই যদি তা রসের হেতু হয়, তবে তাকে জীবন ঘটিত বাস্তব না বলে মানুষের ক্ষুদ্র প্রয়োজনের ক্ষুদ্র স্বার্থ ঘটিত বাস্তব বলাই সঙ্গত।

এখন কথা হলো, এ বাস্তবকে কতখানি সত্য বলে সাহিত্যে গ্রহণ করা যায়। এ বাস্তবকে সাহিত্যে বরণ করে নিতে হলে জীবনের অর্থই যে বদলে যায়। তার মধ্যে কোন মহত্ত্বই যে আর থাকে না। এ কথা আমরা বারবার ভুলে যাই যে, বাস্তব জীবনের কোন নিত্য সংকট বা মানুষের কোন দুর্দশা কবি চিত্তে আঘাত করে কল্পনার পুষ্টি সাধন করতে পারে। কিন্তু যেভাবে তা কাব্যের উপজীব্য হিসেবে প্রযুক্ত হয়, তা কোন সমাধান মূলক চিন্তা নয়, বা তার নগ্নরূপের পরিচর্যা নয়। এতদিনের মানব সভ্যতার সাধনায় যাকে সুন্দর বলে গ্রহণ করেছি তার পরিবর্তে যাকে কুৎসিত বলে গ্রহণ করেছি, তারই সাধনা ও পরিচর্যা মহৎ চিন্তার লক্ষণ নয়। সুস্থ মানবতা প্রসূত বুদ্ধি ও বিবেকজাত সৌন্দর্য বোধের পরিপন্থী এ প্রয়াস মানব কল্যাণে নিয়োজিত শিল্প সাধনায় পর্যবসিত হয় না। বাস্তব জীবনের বস্তু সংকট বিঘ্ন বা বিপত্তি কবি কল্পনার বলে ভাব রূপ ধারণ করে তাতে বাস্তবের সে পীড়াবোধ আর থাকে না। একটি মুধর সান্ত্বনার শান্ত রসে হৃদয় আপ্লুত হয়ে সারা মন-প্রাণ যেন স্নিগ্ধতায় অবগাহন করে উজ্জ্বল গৌর বর্ণ ধারণ করে।

কাব্যে বাস্তবতা সম্পর্কিত একটি অবস্থাই প্রকাশিত হয় এবং তা এমন ভঙ্গিতে হয় যে, সে অবস্থার পূর্ব পর হেতু বা পরিণাম চিন্তা মনকে উত্তেজিত করে না, মন তা মেনে নেয়, বিবাদ বা বিপ্লবে উৎসাহিত হয় না। কেবল তার মধ্যে মানুষের যে মর্ত-নিয়তির গূঢ় ইঙ্গিত রয়েছে, তাই বিদ্যুৎ চমকের মতো এ সৃষ্টি রহস্যকে উদ্ভাসিত করে তোলে। একটি পরম অনুভূতি রসে দেহমন প্রাণের সমগ্র চেতনা চরিতার্থ করে দেয়, কোন সংশয়, শংকা বা বিদ্রোহের অবকাশ থাকে না। কারণ, তখন তা আর কোন নির্দিষ্ট কালের বা স্থানের বা পাত্রের সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ নিয়মের অধীন একটা খণ্ড তথ্যরূপে প্রতীয়মান হয় না। রসিকের চিত্ত যখন এ কাব্য লোকে উত্তীর্ণ হয় তখন সৃষ্টির এই আপাত প্রতীয়মান বৈষম্যগুলো কোন রূপ প্রশ্নকাতরতার বা অধৈর্যের উদ্রেক করে না। যেমন সাগরের অন্তঃস্রোতে-সংঘাতে শক্তির শূন্য হৃদয় মুক্তায় ভরে ওঠে, তেমনি জীবনের সুখ-দুঃখ প্রবাহে নিরন্তর আবর্তিত হয়ে রসিকহৃদয় যে সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, দার্শনিক *schopenhouer*-এর মতে প্রবল জীবনাগ্রহ বা জীবপ্রবৃত্তি will to live সৃষ্টি প্রবাহের একমাত্র উৎস। এ প্রবৃত্তি বশেই মানুষ কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তি পায় না। তিনি মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন এবং যারা এ will-এর শাসন থেকে মুক্ত, সংসার সম্বন্ধে উদাসীন, নিষ্কর্মতাই যাদের জীবনের আদর্শ, অর্থাৎ যারা জ্ঞান মার্গী সন্ন্যাসী তারা জীবপ্রবৃত্তির দাস নয়, তাদের উচ্চমার্গের বিবেক বুদ্ধি grasps the phenomena of life objectively and so can not fail to see clearly the empiricism and fidelity.

দুই ধারা এ সৃষ্টি প্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্তরণ সুখের কামনা করে

তাকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে এরা জীব প্রবৃত্তিকেই প্রশ্রয় দেয়। কারণ তার সাহায্যে লালসার বস্তু পাওয়ার পথ সহজ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ সাধারণ, অতএব সে সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় সম্পর্ক ছাড়া ভোগ করতে পারে না। আর প্রথম শ্রেণীর মানুষের অসাধারণ বিবেক ও জীবপ্রকৃতি ছাড়াও কল্পনা শক্তি রয়েছে, যার মাধ্যমে তার উপভোগ হয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। তাদের কাছে শিল্প সাহিত্য জীবনের প্রতিকূল কিছু নয়, জীবনের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিই সত্যিকার সাহিত্য রস।

কিন্তু কথা হলো, এখন সাহিত্যের নামে যা চলছে তাতে যাঁরা প্রকৃত সাহিত্যরসিক, সত্য সুন্দরের উপাসক, তাদের সব চাইতে দুর্ভাগ্য এই যে, বেরসিকদের বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলবার নেই। যে উচ্চ রসতত্ত্বের বিচারে খাঁটি কাব্য রসে অভিষেক হয়েছিল, তা আজ সাহিত্য প্রসঙ্গে পরাভূত। সুতরাং সত্যিকার রসিক সমাজেরও পরাজয় অনিবার্য। রসবোধের অবকাশ যখন এতটা অন্য খাতে প্রবাহিত, তখন হীনপ্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন-অনুকূল সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি হওয়ারই কথা। তাদের রুচির অনুকূল শিল্প সাহিত্য প্লাবিত এ ধরার ধুলায় তাদের নিজেদের লীলাপঙ্ক পিপাসার সমর্থনে উচ্চ মার্গের দোহাইও তাদেরই আজে। এমন কি ধর্ম সাধনা বলেও এ উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে ও জীবন বেদীতে জয়ডঙ্কা পিটিয়ে তাঁরা আত্মপর সবাইকে, সবার উচ্চারণকে রুদ্ধ করে দিতে চান। এরা কী চান তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাঁদের পিপাসা এখন বিকারগ্রস্থ কেন তাও সহজেই বোধগম্য। কিন্তু এটাই বোধগম্য নয় যে, তাঁরা নিজেদের দধি ভাল বলবার মওকায় 'ক্ষীর দী'—এ সব নামে প্রচারে মিথ্যার আশ্রয় নেন কেন। সরল কথা, যা ন তা খোলাসা করে বললেই হয়। বলতে পারেন, আমরা একালের নুষ, আমরা রস বলতে এইটেই বুঝি। আমাদের প্রাণে কোন

গভীরতর আকুতি নেই। ক্ষণিকের ক্ষুদ্র উত্তেজনা, শ্রান্ত, পীড়ি
নির্জীব স্নায়ু গ্রন্থির জ্বালা নিবারণকল্পে যে কোন উগ্র ভেষজ-বি
প্রলেপ, মানসিক চর্মরোগের কণ্ডূ দাবানল বা সর্বদস্ত্র হুতাশ
আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এ সাদা সত্য কথাটি ঘোর প্যাঁচের মাধ
ঘোলাটে টেকনিকে 'ইমপ্রেশন এবং একস্‌প্রেশন কিউব অবশে
সাররিয়াল' — এ সবের মাহাত্ম্যকীর্তনের মিথ্যা ভান কেন? এ
রসিক ও রস বোদ্ধা এবং যথেষ্ট চতুর রসের ধারক ও বাহক। এঁ
ছাড়া বাকী সব আহাম্মক — রসবোধ বা রস গ্রহণে অক্ষম
ধারণায়ই তারা বেশবাস পরিত্যাগ করে তাণ্ডব তালে নৃত্যে অবত
করে বিশ্বময় নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ-তরুণ-তরুণী সবার সামনে ভগ
প্রদত্ত আপন অবয়বটি উন্মুক্ত করে দিয়ে সর্বাঙ্গ সঙ্গীত ও সর্বাঙ্গ নৃ
উন্মত্ত হয়েছেন। এঁদের উদ্দেশ্য করে কোন সমালোচক বলেছেন :

স্পষ্ট দেখছি, তোমাদের রসবোধ দৈহিক রতি-দুঃখশীল
অধিক কিছু নয়, তোমাদের সাহিত্যপিপাসার মূলে আছে অতি
বাস্তব ব্যক্তিগত আত্মতৃপ্তির প্রয়োজন; যে রিপুগুলো বা রিপুবিশে
জীবনের ক্ষেত্রে চরিতার্থ করার নিদারুণ বাসনা রয়েছে, অথচ যে
করে তা সাধন করার শক্তি নেই, সে রিপুর তাড়নাকে প্রত্যক্ষ দে
ক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে—দেহের ভারমুক্ত কায়াহীন ছায়ারা
অতি স্থূল মানসিক সংবেদন রূপে উপভোগ করতে চাও। তোম
সাহিত্য এ বাস্তব সমস্যাসঙ্কুল দেহ-মানসের জগতকে আশ্রয় ব
আকার ও প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে।

এ কথা সবাই স্বীকার করে নিয়েছে যে, আধুনিক কাব্যে
দৃষ্টি বা কল্পনার অবকাশ নাই। দেহ-বাস্তবের পীড়ন বা ভ

সংগ্রামের নানাবিধ জয় পরাজয়, ক্ষোভ দম্ভ, উল্লাস অবসাদের সঠিক বিকৃতিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা, ইন্দ্রিয় বিকারের উত্তেজনায় স্বমত প্রতিষ্ঠার অধীরতা, খণ্ড ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত জীবনকেই বাস্তব সত্য বলে মনে করে তাকে নিয়ে নেড়েচেড়ে বিচিত্র মানসিক কসরৎ, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বকীয় আদর্শ অনুসারে নতুনতর সংহিতা রচনা এবং জীবনের বাস্তব সমস্যার নিত্য নবতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন এই হলো, কবি প্রতিভা। এ আধুনিক সাহিত্য কর্মের প্রধান উপজীব্য হলো, অতি জাগ্রত জীবন চেতনা ও তারই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত বিকারের তথ্য। এ সাহিত্যের বিজয় নিশান এর তীব্র তীক্ষ্ণ শাণিত বাচন ও শরীর নির্মিত। এ রূপ বাস্তববাদ যে সাহিত্যের মূল মন্ত্র, দেহ স্বতন্ত্রের নির্বিকার যৌন প্রকাশ যে কাব্যের প্রেরণা, যে সাহিত্য সৃষ্টির রহস্য রসের আস্বাদন না করিয়ে, মানুষের অহং প্রবৃত্তিকে শান্ত পরিতৃপ্ত ও অবলুপ্ত না করে, সে অহংকারকে বিরক্ত বিক্ষুব্ধ করে তোলে, সমাজ ও সংস্কারের বিরোধিতাকে উদ্ভাবন করে নানা সমস্যার জালে আচ্ছন্ন করে, কামনা বাসনার উদ্রেক করে তার কামায়ন বা বস্তুয়নই মূল লক্ষ্য তা প্রকৃত জীবনমুখী আর্ট কি না তার বিচারের ভার তো তারই হাতে, যিনি এ কর্মে মুক্তকচ্ছ হয়ে লেগেছেন।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, অতিহীন স্বার্থ লালসা, আত্মার অবমাননা মিথ্যাচার চৌর্যবৃত্তি ও দুর্বলের আত্ম বিলাপ এ সবই স্বৈরাচারের জন্ম দেয়। আর সে কারণেই জীবনধর্মী স্বাস্থ্যবান মানুষ কোন দিনই এ সবের সমাদর করতে পারেন না। বরং জীবনমুখী প্রবণতা প্রসূত ধিক্কার ও ঘৃণা প্রকাশই সুস্থ জীবনের লক্ষণ বলে গৃহীত হওয়া উচিত। সে কামনা স্বৈরাচারের উর্ধ্বে উঠতে পারে না, যাতে

আত্মত্যাগের সুখ নাই, যা দীন দুঃখীর ভোগ লালসার মতো কৃপার উদ্রেক করে, নিজ পাত্র কণ্ডূয়নে পশুর যে তৃপ্তি তার অধিক যে কামনার লক্ষ্য নয়, সুস্থ মানুষের সমাজে সে কামনার স্থান নাই।

এ পর্যন্ত যা বলা হলো, তাতে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে আশা করি, যে মডার্নিজম নিজে মন্দ নয়, এবং আলট্রা মডার্নিজম্ অর্থাৎ কাব্য সাহিত্যে তথা শিল্পের সর্বক্ষেত্রে যে এ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ আর্টের প্লাবন এসেছে, সে বন্যায় ভালমন্দ সব ধুয়ে মুছে নিয়ে প্রচার মাহাত্ম্যে ও আপাত সুড়সুড়ি জাত ইন্দ্রিয় সুখ-স্পর্শের প্রলোভনে এ ধারার বোদ্ধা ও প্রবক্তার সংখ্যাধিক্য ঘটছে। কিন্তু সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধে গণতন্ত্র পন্থায়, বিশেষ রীতির পরিবেশনায় কোন রীতিকে মঙ্গলজনক মনে করা যায় না। যা মঙ্গলের যা কল্যাণের তা শাশ্বত চিরন্তন। ক্ষণিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আত্মতৃপ্তি ও আত্ম বিপর্যয় একার্থবোধক। জীবনমুখী ধারণার মঙ্গলময় সুস্থ রস নিবেদনের প্রয়াসেই সত্যিকার সার্বজনীন আর্ট গ্রহণীয় হয়ে উঠে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অপরিশীলিত রুচি অনুসারী দৃষ্টিভঙ্গীজাত বা ওর প্রবণতা এর দৈহিক ও জৈবিক দিকটির আকাঙ্ক্ষা ও কামনার অপরিচ্ছন্ন প্রকাশ, তা বিমূর্ত কিংবা সমূর্ত যাই হোক, সমাজের জন্য কিংবা ব্যক্তি বিশেষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনেনা। আর তাই এর পরিচর্যাও অকল্যাণকর।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ।। *কল্লোল যুগ*

২ অতুলচন্দ্র গুপ্ত ।। *কাব্য জিজ্ঞাসা*

৩ কাজী দীন মুহম্মদ ।। *সাহিত্য শিল্প*

৪ জহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ।। *সাহিত্য-দীপিকা*

৫ জীবনানন্দ দাশ ।। *শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন*

৬ বুদ্ধদেব বসু ।। *হঠাৎ আলোর ঝলকানি*

৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।। *সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, আধুনিক সাহিত্য*

৮ শুদ্ধসত্ত্ব বসু ।। *বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ*

৯ শ্যামাপদ চক্রবর্তী ।। *অলঙ্কার চন্দ্রিকা*

১০ শ্রীশ চন্দ্র দাস ।। *সাহিত্য সন্দর্শন*

১১ সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত ।। *সাহিত্য পাঠের ভূমিকা*

১২ সৈয়দ আলী আহসান ।। *কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা*

১৩ হেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ।। *সমাজ সাহিত্য ও দর্শন*

১৪ A. Balakian ।। *Literary Origins of Surrealism*

১৫ Albert C. Baugh ।। *Literary History of England* ed. vol. I-III

১৬ Aristotle ।। *Poetics*

১৭ H. Read ।। *A Short Survey of Surrealism*

১৮ Hudson ।। *An Introduction to the Study of Literature*

১৯ J. B. Nos ।। *Man's Religions*

২০ M. W. Alsid & W. Kenney ।। *The World of Ideas*, ed. (Essays for Study)

২১ S. H. Steinberg ।। *Cassells Encyclo. of Literature*, ed. ol. I-II